অন্তিম সুখী লেখক
রলাঁ বার্ত

আজ আমাদের সাথে ভলতেয়ারের মিল কোথায়? আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গিতে তাঁর দর্শন তামাদি হয়ে পড়েছে। আজও হয়তো অস্তিত্বের স্থায়িত্ব এবং ইতিহাসের বিশৃঙ্খলায় বিশ্বাস করা যায়, কিন্তু সেটা আর ভলতেয়ারের মতো করে নয়। এখন আর নাস্তিকেরা ডিইস্টদের[১] চরণে নিজেদের সমর্পণ করে না; তাছাড়া তাদের অস্তিত্বও লোপ পেয়ে গিয়েছে। ডায়ালেক্টিকস ধ্বংস করেছে ম্যানিকিয়ানিজম[২] (Manicheanism), আমরা ক্বচিৎ ঈশ্বর-করুণার উপায় নিয়ে আলোচনা করি। আর ভলতেয়ারের শত্রুরা হয় লোপ পেয়েছে, নয় রূপান্তরিত হয়েছে; আর কোথাও কোন জ্যানসনিস্ট[৩] (Jansenist) বা সোসিনিয়ান[৪] (Socinian) নেই, নেই কোন লাইবনিৎজিয়ান[৫] (Libneizian); জেসুইটদের[৬] (Jesuit) নামও আর নোনোৎ (Nonotte) বা পাতুই (Patouille) হয় না।

আমি প্রায় বলতে যাচ্ছিলাম, এখন আর কোন ধর্মতদন্ত (Inquisition) হয় না। কথাটি অবশ্য সত্যি নয়। যেটা অন্তর্হিত, সেটা হচ্ছে উৎপীড়নের মঞ্চ, উৎপীড়ন নয়, অটো-দা-ফে (auto-da-fe) এখন সূক্ষ্ম ও পরিশীলিত হয়েছে পুলিশি অপারেশনে, জীবন্ত পোড়ানোর খুঁটির জায়গা নিয়েছে প্রতিবেশীদের দ্বারা সতর্কভাবে এড়িয়ে যাওয়া কনসেনট্রেশন ক্যাম্প। এর ফলে গুণতির হিসেব গিয়েছে পাল্টে। ১৭২১ সালে ন'-জন পুরুষ ও এগারোজন মহিলাকে গ্রেনাডার বধ্যমঞ্চে চারটি উনুনে জীবন্ত পোড়ানো হয়েছিল; আর ১৭২৩ সালে মাদ্রিদে ফরাসী রাজকুমারীর আগমন স্মরণীয় করতে ন'-জন মানুষকে জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। সন্দেহ নেই, তারা তাদের জ্ঞাতি ভাইকে বিয়ে করার মতো কাজ কিংবা শুক্রবারেও মাংস আহার করেছিল। এটা এক বীভৎস দমননীতি, যার অযৌক্তিকতা বহন করে চলেছে ভলতেয়ারের গোটা রচনাবলী। কিন্তু ১৯৩৯ থেকে ১৯৪৫ সালের মধ্যে ৬০ লক্ষ মানুষকে হত্যা করা হয়, প্রধানত যেহেতু তারা বা তাদের বাবা-মা, কিংবা তাদের দাদু-দিদিমা ছিলেন ইহুদি।

তবু এর বিরুদ্ধে আমাদের কোন ইস্তাহার নেই। বোধহয় তার নির্ভুল কারণ এই বদলে-যাওয়া নিহতের সংখ্যা। এটা সরলীকরণ মনে হতে পারে, কিন্তু ভলতেয়ারী গোলন্দাজির লঘুতা আর আঠারো শতকের বিক্ষিপ্ত ধর্মীয় অপরাধের মধ্যে একটা আনুপাতিক মিল রয়েছে। পরিমাণের দিক থেকে সীমিত, মানুষ পোড়ানোর খুঁটি এবার একটি নীতিতে পরিণত, অর্থাৎ একটা লক্ষ্য, যাকে আক্রমণ করা বিরোধীদের পক্ষে খুব সুবিধের—এসব বিষয় নিয়েই সার্থক লেখকেরা গড়া। সাম্প্রদায়িক অপরাধের এই

বিপুলতা, রাষ্ট্রের দ্বারা তার আয়োজন, এক আদর্শের মুখোশ দিয়ে তার ওপর ন্যায্যতার ছাপ মারা—এইসব ঘটনা বর্তমান লেখকদের ইস্তাহারের চেয়ে বড় ও গভীর বিষয়ে জড়িয়ে নেয়, ব্যঙ্গের বদলে দর্শনে, স্তম্ভিত করার চেয়ে ব্যাখ্যার দাবী নিয়ে আসে। ভলতেয়ার-পরবর্তী কালে ইতিহাস বন্দী হয়ে আছে এমন দুঃসাধ্যতায়, যা বিশ্বস্ত সাহিত্যকে বিদীর্ণ করে দেয় এবং যা ভলতেয়ারের কখনও জানা ছিল না : স্বাধীনতার শত্রুদের জন্য কোন স্বাধীনতা নয়—কেউ আর কাউকে সহিষ্ণুতার শিক্ষা দিতে পারে না।

সংক্ষেপে বলতে হলে ভলতেয়ার থেকে আমাদের পার্থক্য এই যে, উনি ছিলেন একজন সুখী লেখক। অন্য সকলের চেয়ে ভালভাবে তিনি যুক্তির লড়াইকে দিয়েছিলেন এক উৎসবের মেজাজ। তাঁর যুদ্ধে সবকিছুই উজ্জ্বল ও দর্শনীয়; প্রতিপক্ষের নাম সর্বদাই উপহাসযোগ্য; বিতর্কিত মতবাদ প্রস্তাবনায় পরিণত (ভলতেয়ারের পরিহাস ও ব্যঙ্গ আবশ্যিক ভাবেই এক বেখাপ্পাপনার উন্মোচন)। যুক্তির বিন্দুগুলি সাজানো হয়, তারা চতুর্দিকে ছিটকে পড়ে কোন এক খেলার ঘুঁটির মতো, আর দর্শনার্থীদের সকল শ্রদ্ধা ও সমস্ত করুণা বিকীরণ করে। হাজার খানেক স্বচ্ছ কিন্তু ছদ্মনামের আড়ালে থাকা যোদ্ধার সচলতা তাঁর ইউরোপ পরিক্রমাকে এক ধরনের প্রহসনের ভান বা স্থায়ী ধূর্তামিতে পরিণত করেছিল। ভলতেয়ারের সাথে এই জগতের খটাখটি শুধু একটি দৃশ্য নয়, এক উচ্চাঙ্গের প্রদর্শনী—অনেকটা পানচিনেল্লো (Punchinello) পুতুলনাচের মতে, যা ভলতেয়ারের এত প্রিয় ছিল যে তিনি সিরেতে নিজের একটি পুতুলনাচের থিয়েটার শুরু করেছিলেন।

ভলতেয়ারের প্রথম সুখ নিঃসন্দেহে তাঁর কালের। তবে সেই সময়কাল যে খুব দুঃসহ ছিল তা নিয়ে ভুল করার কোন কারণ নেই, আর ভলতেয়ার তাঁর লেখার সর্বত্র তাঁর বীভৎসতার বর্ণনা করেছেন। তবু অন্য কোন যুগ একজন লেখককে এত বেশি সাহায্য করেনি, তিনি যে একটি সৎ আদর্শের জন্য যুদ্ধ করছেন তার প্রতি এত বেশি নিশ্চয়তা ও সমর্থন জানায়নি। যেখান থেকে ভলতেয়ার উঠে এসেছেন সেই বুর্জোয়া সমাজ তখন দেশের অর্থনীতির অধিকাংশ নিয়ন্ত্রণ করত। শিল্প ও বাণিজ্য, দেশের মন্ত্রীসভা, সংস্কৃতি ও বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ের গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠান করে তাঁরা মনে করতেন, তাঁদের সমৃদ্ধি জাতির উন্নতি ও নাগরিকদের স্বাচ্ছন্দ্যের সাথে সমার্থক। এর সপক্ষে ছিল কার্যকরী ক্ষমতা, পদ্ধতির সুনিশ্চয়তা এবং রুচির আগমার্কা ঐতিহ্য, আর বিপক্ষে দুর্নীতি, মূঢ়তা এবং হিংস্রতা। এমন একটি আদ্যোপান্ত নিন্দনীয় শত্রুর সাথে কলম দিয়ে লড়াই করা দারুণ সুখ ও শান্তির ব্যাপার বই কি! এখানে ট্র্যাজিক চেতনা তীব্র, কেননা প্রাকৃতিক বাধ্যবাধকতার জন্য তার প্রতিপক্ষের মহত্ত্ব স্বীকার করতে হয়। ভলতেয়ারের কোন ট্র্যাজিক আত্মা ছিল না। তাঁকে কোন জীবিত শক্তির সঙ্গে নিজেকে তুলনা করতে হয়নি। কোন ধারণা, মতবাদ বা ব্যক্তি তাঁকে চিহ্নিত করে তুলতে পারেনি (শুধু অতীতে পাস্কাল ও ভবিষ্যতে রুশো ছাড়া; তবে তিনি ওই দু'জনকেই ভেল্কি দেখিয়ে হঠিয়ে দিতে পারতেন)। আর জেসুইট, জ্যানসেনিস্ট, পার্লামেন্ট—সবই ছিল বুদ্ধি নিংড়ে-ফেলা ঠান্ডা

জমাট-বাঁধা প্রতিষ্ঠান, যা হৃদয়-মনের পক্ষে অসহ্য এক হিংস্রতায় ভরা। প্রশাসনের নিষ্ঠুরতম রূপও ছিল একটা সাজ, যা মানুষের সন্ধানী দৃষ্টির সামনে ফেলে দিলে হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়বে। ভলতেয়ারের সেই চালাকি ভরা কোমল দৃষ্টি ছিল। মাদাম দ্য জঁলি[৭] (Mme de Genlis) আমাদের বলেছিলেন, জাইরের হৃদয় রয়েছে তার আঁখিতে), যার বিধ্বংসী ক্ষমতা হচ্ছে ওই সমাজ-প্রশাসক ভয়ঙ্কর মুখোশগুলোর মধ্যে প্রাণের সঞ্চার করায়।

ফলে এমন একটা জগৎ, যেখানে মূঢ়তা ও বলবত্তা একই পথের পথিক, তার সাথে লড়াই করাটা ছিল একটি একক সুখের ব্যাপার। হৃদয়ের পক্ষেও এটা ছিল বেশ সুবিধেজনক অবস্থান। লেখক ছিলেন ইতিহাসের পক্ষে, আরো সুখের কথা, তিনি ইতিহাসকে বুঝেছিলেন উৎকর্ষের বদলে একটি সুসম্পূর্ণতার মত, ফলে ইতিহাসের সাথে তিনি ভেসে যাননি।

ভলতেয়ারের দ্বিতীয় সুখ ইতিহাসকে ভুলে থাকায়, ঠিক যখন ইতিহাস তাঁকে সমর্থন করছিল। সুখী হওয়ার জন্য ভলতেয়ার সময়কে ঝুলিয়ে রেখেছিলেন, অর্থাৎ তাঁর দর্শনের মূলে ছিল জাড্যতা। আমরা জানি, তিনি ভাবতেন ঈশ্বর এই জগৎ নির্মাণ করেছেন একজন জ্যামিতিকার হিসেবে, একজন পিতা হিসেবে নয়। তার অর্থ, তিনি তাঁর সৃষ্টির সঙ্গে চলতে চান না। একবার সৃষ্টি করে চালিয়ে দেওয়ার পর এই বিশ্বের সাথে ঈশ্বরের আর সম্পর্ক নেই। ফলে চিরকালের জন্য একটি কার্যকারণ সম্পর্ক স্থাপিত হয়ে গেল। কোন বস্তু যেমন সীমাহীন হতে পারে না, তেমনি কারণ ছাড়া কোন কাজ হওয়া অসম্ভব এবং একের সাথে অন্যের সম্পর্ক একেবারে অপরিবর্তনীয়। সুতরাং ভলতেয়ারের অধিবিদ্যা হচ্ছে পদার্থবিদ্যার উপক্রমণিকা এবং ঈশ্বরকরুণা তাঁর কাছে বলবিদ্যার সমার্থক। যখন ঈশ্বর তাঁর সৃষ্ট জগৎ থেকে অন্তর্হিত হন (যেমন ঘড়িনির্মাতা তাঁর ঘড়ি বানানোর পর) তখন থেকে আর মানুষ বা ঈশ্বর আর নিজে নিজে চলে না। অবশ্যই ভাল ও মন্দের অস্তিত্ব রয়েছে, কিন্তু আমাদের সেগুলো দেখতে হবে আনন্দ ও দুঃখ হিসেবে, পাপ বা পুণ্যের মত করে নয়, কেননা সেগুলো নিছক মহাবিশ্বের কার্যকারণের উৎপাদন মাত্র। এগুলোর একটি প্রয়োজন রয়েছে, কিন্তু সেই প্রয়োজনটা নৈতিক নয়, যান্ত্রিক। ভালোত্ব কোন পুরস্কার দেয় না, মন্দত্ব কোন সাজা প্রদান করে না। ভালো-মন্দ থেকে ঈশ্বরের অস্তিত্ব বা তাঁর সবদিকে নজর রাখার বিষয়টি প্রমাণিত হয় না। শুধু বোঝা যায়, তিনি ছিলেন এবং তিনি সৃষ্টি করেছেন।

যদি মানুষ নৈতিক অভিঘাতের সাহায্যে মন্দ থেকে ভালোর দিকে রূপান্তরের চেষ্টা করে, তবে সে কার্যকারণের বিশ্বজনীন রীতিকে আহত করে। এই আন্দোলনের ফলে শুধু একটি বিশৃঙ্খল প্রহসন সৃষ্টি হয় (যেমন মেমনো Memno) বিজ্ঞ হতে চেয়ে করেছিলেন)। আর তাহলে মানুষ ভালো আর মন্দ নিয়ে কী করতে পারে? খুব বেশি কিছু নয়। সৃষ্টি নামের এই মেশিনে শুধু একটি খেলার জায়গা রয়েছে, যেখানে স্রষ্টা খুব সামান্য পরিমাণে তাঁর ঘুঁটিগুলো নাড়াচাড়া করতে দেন। এই খেলার নাম হচ্ছে যুক্তি। এটা খুব খামখেয়ালি ব্যাপার, এটা ইতিহাসের কোন অভিমুখ প্রত্যয়ন করে না। যুক্তি আসে, যুক্তি উবে যায়,

কোন একান্ত ব্যক্তিগত মানসিক প্রচেষ্টা ছাড়া আর কোন নিয়ম মেনে নয়। ইতিহাসের উপকারিতার মধ্যে (যেমন দরকারী আবিষ্কার, মহৎ কাজকর্ম) এক ধারাবাহিকতার সম্পর্ক রয়েছে, কিন্তু কোন আনুষ্ঠানিকতার সম্পর্ক নেই। সময়ের বুদ্ধিমত্তা সম্পর্কে ভলতেয়ারের বিরোধিতা খুবই তীব্র। ভলতেয়ারের কাছে ইতিহাস একটি সময়-সারণি, ইতিহাসের আধুনিক অর্থের কোন স্থান নেই তাঁর কাছে। তিনি ইতিহাস লিখেছেন বিশেষভাবে এটা বলার জন্য যে তিনি ইতিহাসে বিশ্বাস করেন না। তাঁর মতে সম্রাট চতুর্দশ লুইয়ের যুগ একটা সংগঠন নয়, এটা একগুচ্ছ আকস্মিক ঘটনার সমপাতন—এখানে ড্রাগোনাদ[৯] (Dragonades) সেখানে রাসিন[১০] (Racine) ইত্যাদি। প্রকৃতি নিজে কখনও ঐতিহাসিক নয়, প্রকৃতপক্ষে আর্ট অর্থাৎ ঈশ্বরের চাতুরী, তাই নড়তে চড়তে পারে না, নড়েওনি। কারখানায় মাটি ও জল দিয়ে পর্বত নির্মাণ করা হয়নি, ঈশ্বর একবারে সমস্ত জিনিস গড়ে তুলেছেন তাঁর তৈরী জীবজগতের জন্য। আর মাছের ফসিল,যার আবিষ্কার সেই আমলকে তোলপাড় করে ফেলেছিল, সেগুলো হচ্ছে প্রোসাইক যুগের তীর্থযাত্রীদের চড়ুইভাতি করে ফেলে রেখে যাওয়া মাছের কাঁটা ও হাড়গোড় মাত্র। (তাঁর মতে) এর ভেতর কোন জৈবিক বিবর্তন নেই।

সময়ের দর্শন আসলে উনিশ শতকের (এবং শুধুমাত্র জার্মানির) অবদান। আমরা ধরে নিতে পারি, ভলতেয়ার এবং তাঁর সমগ্র যুগব্যাপী অতীত সম্পর্কে আপেক্ষিকতার পাঠ প্রতিস্থাপিত হয়েছে দেশ (Space) এর আপেক্ষিকতা দিয়ে। প্রাথমিক দৃষ্টিতে দেখলে বলা যায় আঠারো শতক শুধু ভ্রমণের স্বর্ণযুগ নয়, এই যুগেই ধনতন্ত্র, বিশেষ করে ব্রিটিশ ধনতন্ত্র নিশ্চিতভাবে চিন থেকে দক্ষিণ আমেরিকা পর্যন্ত তার বাজার দখল করেছিল। সর্বোপরি এই যুগেই ভ্রমণ থেকে উত্তরাধিকার বর্তায় সাহিত্যে এবং তার সাথে একটা দর্শন জড়িয়ে নেয়। আমরা এক্সোটিসিজম[১১] (Exotism) এর জন্মের ক্ষেত্রে জেসুইটদের ভূমিকার কথা জানতে পারি তাঁদের *Edifying and Curious Letters* এর মাধ্যমে। ওই শতাব্দীর শুরু থেকে এইসব উপাদান পরিবর্তিত হয়ে অচিরেই নানা খাঁটি এক্সোটিক জাতির সৃষ্টি করে। আমরা পাই মিশরীয় জ্ঞানী, মোহম্মদী আরব, তুর্কি, চিনা, শ্যামদেশীয় এবং সবচেয়ে সম্মাননীয় পারসিক গুণীজন। এইসব প্রাচ্যদেশীয়রা ছিলেন দর্শনের শিক্ষক। কী ধরনের দর্শন সেটা বলার আগে আমরা লক্ষ করবো যখন ভলতেয়ার তাঁর কাহিনীগুলি (যা অনেকাংশে প্রাচ্যের লোককথা-নির্ভর) লিখতে শুরু করেন, তখন ওই শতাব্দী এক্সোটিজমের যথার্থ অলঙ্কার বিস্তার করেছে। এটা এক ধরনের সংহিতা, যার অবয়বগুলি এত সুন্দর ও সুপরিচিতভাবে রচিত যে সেগুলো আর অতিবিস্তৃত ও অতিচমকিত করে বর্ণনা না করেও ব্যবহার করা যায়। ভলতেয়ার এই স্টাইলে এগুলো ব্যবহার করতে কসুর করেননি, কেননা তিনি কখনও মৌলিক (যা একটি আধুনিকতর ধারণা) হবার কষ্ট করেননি। তিনি ও তাঁর সমসাময়িক সকলের কাছে প্রাচ্য কোন যথার্থ আলোচ্য বিষয় নয়; এটা আসলে একটা সঙ্কেতশব্দ, যা বক্তব্য প্রকাশের জন্য বেশ সুবিধেজনক।

এইভাবে ধারণা গড়ে তোলার ফল হচ্ছে, ভলতেয়ারের পরিক্রমার কোন গভীরতা

নেই, যে জায়গায় তিনি এমন মোহগ্রস্তভাবে ব্যপ্ত থাকেন (আর আমরা তাঁর কাহিনীগুলির ভেতর দিয়ে শুধু ভ্রমণ করি) সেটা কোন অনুসন্ধানের ক্ষেত্র নয়, শুধু একজন আমিনের মাপজোক করার মতো জায়গা। আর ভলতেয়ার যেটা চিনা বা পারসিক মানবিকতা থেকে ধার করেন, সেটা একটা নতুন সীমারেখা মাত্র, কোন নতুন বিষয় নয়। সিন থেকে গঙ্গা পর্যন্ত সমৃদ্ধ হয়ে ওঠা নতুন জনবসতি হচ্ছে মানবিকতার নির্যাস, আর ভলতেয়ারের উপন্যাসগুলো তদন্তের তুলনায় বেশি পরিমাণে একজন স্বত্বাধিকারীর পরিদর্শনের, যাঁকে আমরা কোন নির্দিষ্ট ছকে সাজাই না, কেননা তাঁর তালুক কখনো পাল্টায় না এবং যাঁকে আমরা কোন নির্দিষ্ট ক্রমে থামিয়ে দিয়ে আমরা কি দেখেছি তার বদলে আমরা কি, তাই নিয়ে আলোচনা করি। এটাই ব্যাখ্যা করে যে ভলতেয়ারের পরিক্রমা কেন বাস্তববাদীও নয়, কারুকার্যখচিতও নয় (শতাব্দীর প্রথম চিত্রোপম বর্ণনাগুলির ধারা ততদিনে শুকিয়ে গিয়েছিল)। এটা এমনকী কোন জ্ঞানের প্রক্রিয়া নয়, এটা শুধু একটা সত্যার্পণ, একটা লজিকের নিয়ম, একটা সমীকরণের সংখ্যা মাত্র। প্রাচ্যের এইসব দেশ, আজকাল যাদের এত গুরুত্ব, বিশ্ব রাজনীতিতে যারা একক ব্যক্তিত্ব, তারা ভলতেয়ারের জন্য কতগুলি ফর্ম, আসল বিষয়বস্তু ছাড়া কতগুলি চিহ্ন, শূন্য ডিগ্রি তাপমাত্রার শীতল মানবিকতা, যা কেউ নিজেকে সুচিহ্নিত করতে চট্ করে আঁকড়ে ধরে।

এমনটাই হচ্ছে ভলতেয়ারীয় পরিক্রমার বিরোধাভাস, এক স্থিতিজাড্য সুপ্রকাশ করা। সেখানে অবশ্যই আমাদের চেয়ে আলাদা আদব-কায়দা, পৃথক আইন ও অন্যতর মূল্যবোধ আছে এবং ভলতেয়ার পাঠ আমাদের ওইসব জিনিস শেখায়। কিন্তু এই বিভিন্নরূপতা মানবিক নির্যাসের অঙ্গ এবং ফলস্বরূপ খুব শিগগীর তার ভারসাম্যের বিন্দু খুঁজে পায়। একে স্বীকার করে নেওয়াই একে শেষ করে দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট—মানুষ (অর্থাৎ পাশ্চাত্যের মানুষেরা) খানিকটা সংখ্যাবৃদ্ধি করুক, চিনা ঋষিদের দ্বিগুণ হোক ইউরোপীয় দার্শনিকের সংখ্যা, তাহলেই সৃজনশীল হুরন[১২] (Huron) এবং বিশ্বজনীন মানবের সৃষ্টি হবে। নিজেকে শক্তিমান করে তোলা নিজেকে পরিবর্তন করতে নয়, নিজেকে সুনিশ্চিত করতে—ভলতেয়ার-পরিক্রমার লক্ষ্য হচ্ছে এই।

সন্দেহ নেই, ভলতেয়ারের দ্বিতীয় সুখ উৎপন্ন হয়েছিল এই বিশ্বের অজঙ্গমতার ওপর নির্ভর করতে পারায়। বুর্জোয়া শ্রেণী ক্ষমতার এত কাছাকাছি ছিল যে তারা ইতিমধ্যেই ইতিহাসকে অস্বীকার করতে শুরু করেছিল। এটা যে কোন সংগঠনকে বর্জন করতে পারত, সন্দেহ করতে পারত কোন সুসংবদ্ধ দর্শনকে, অর্থাৎ তুলে ধরতে পারত তার নিজস্ব চিন্তা ও শুভবোধের প্রকৃতি, যা কোন মতবাদ বা বৌদ্ধিক তন্ত্রকে পীড়া দেবে। ভলতেয়ার এটাই অসামান্যভাবে করেছিলেন, আর এই ছিল তাঁর তৃতীয় সুখ—তিনি অবিরত বুদ্ধি ও আলোকপ্রাপ্তির সংযোগ বিচ্ছিন্ন করতে চেয়েছেন। তাই দাবী করেছেন, পৃথিবীটা যথেষ্ট সুশৃঙ্খল থাকে যদি আমরা তাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করার চেষ্টা না করি; এটা একটা সিস্টেম যদি আমরা একে সিস্টেমের মধ্যে আনার চেষ্টা ত্যাগ করি। এই চিন্তাধারার ভবিষ্যৎ বেশ উজ্জ্বল ছিল—আজকের যুগে আমরা একে বলি অ্যান্টি-ইন্টেলেকচুয়ালিজম।

লক্ষ করার বিষয়, ভলতেয়ারের শত্রুদের নাম সন্দেহাতীত ভাবে বলা যায়, কারণ তাঁরা তাঁদের সুনিশ্চিত কর্মপন্থার জন্য চিহ্নিত। যেমন জেসুইট, জ্যানসেনিস্ট, সোসিনিয়ান, প্রটেস্টান্ট, নাস্তিক, সবাই পরস্পরের শত্রু, কিন্তু ভলতেয়ার তাঁদের সবাইকে একটিমাত্র শব্দে চিহ্নিত করায় তাঁর বিরুদ্ধতায় সবাই এককাট্টা। অন্যদিকে তাঁর চিন্তাধারা নামকরণের ক্ষেত্রে তাঁর মনোবৃত্তি পলায়নপর। মতবাদের দিক থেকে তিনি কি ডিইস্ট (Deist)? একজন লাইবনিৎজিয়ান? নানক যুক্তিবাদী র‍্যাশনালিস্ট! প্রত্যেক ক্ষেত্রেই এর উত্তর হ্যাঁ এবং না। সিস্টেমের প্রতি বিদ্বেষই তাঁর একমাত্র সিস্টেম (আর আমরা জানি এরকম একটি সিস্টেমের চেয়ে ভয়ানক আর কিছু হয় না)। আজ তাঁর শত্রু হতে পারতেন ইতিহাস ও বিজ্ঞানের আদর্শবাদীরা (তাঁর The Man with forty Ecus বইতে শুদ্ধ বিজ্ঞান নিয়ে ব্যঙ্গ দ্রষ্টব্য), মার্কসিস্ট, অস্তিত্ববাদী, বামপন্থী ইন্টেলেকচুয়াল—ভলতেয়ার ওঁদের ঘৃণা করতেন, ওঁদের ঢেকে দিতেন অবিরাম লাজ্জি (Lazzi) জোকস দিয়ে, যেমন তিনি তাঁর আমলে করেছেন জেসুইটদের। বুদ্ধিকে ক্রমাগত আলোকপ্রাপ্তির বিরুদ্ধে দাঁড় করিয়ে, একটিকে দিয়ে অন্যটিকে হেয় করে, মতবাদের দ্বন্দ্বকে এক ধরনের বোকামি ও বুদ্ধিমত্তার মধ্যে ম্যানিকিয়ান (Manichean) বিবাদে পরিণত করে, সমস্ত সিস্টেমকে মূর্খতা ও সমস্ত রকমের মানসিক যুক্তিকে বুদ্ধির সমতুল্য বলে চিহ্নিত করে ভলতেয়ার লিবারেলিজমকে একটা বিরুদ্ধবাদী অবস্থানে নিয়ে এসেছিলেন। একটি সিস্টেম-বিরোধী সিস্টেম হওয়ার কারণে কৌশলে এড়িয়ে গিয়েও মন্দ বিশ্বাস থেকে ভাল বিবেক, সারপদার্থ সম্পর্কে নৈরাশ্য থেকে রূপনৃত্য, ঘোষিত সন্দেহবাদী থেকে সন্ত্রাসবাদী দ্বিধার মধ্যে যাতায়াত করার ফলে অ্যান্টি-ইন্টেলেকচুয়ালিজম দুদিক থেকেই কৌশলে এড়িয়ে যেতে এবং সুবিধা আদায় করতে পারে।

ভলতেয়ারীয় উৎসব এইরকম অফুরন্ত বাহানা দিয়ে রচিত। ভলতেয়ার একই সঙ্গে পর্যালোচনা করেন এবং এড়িয়ে যান। যে ব্যক্তি এক্রাসঁ ল্যঁফাম (Ecrasons L'infame) এর মত আন্তরিক শ্রদ্ধা জানিয়ে তাঁর সমস্ত চিঠি শেষ করেন, তাঁর পক্ষে জগৎ খুব সরল। আমরা জানি, এই সারল্য ও সুখ কেনা হয়েছে ইতিহাসকে চেঁচে ফেলে এবং এই জগৎকে জঙ্গম দেখতে না চেয়ে। অধিকন্তু জ্ঞান ও সংস্কৃতি বিরোধিতার ওপর চোখ-ধাঁধানো জয় সত্ত্বেও এমন সুখ অনেকের ভাগ্যেই জোটেনি। এইভাবে, কিংবদন্তীর সাথে তাল মিলিয়ে বলা যায়, রুশো নিঃসন্দেহে ছিলেন ভলতেয়ার-বিরোধী। জোর দিয়ে সমাজ দ্বারা মানুষের দুর্নীতিকে প্রতিষ্ঠা করে রুশো আবার ইতিহাসকে সচল করে তুললেন, ইতিহাসের উৎকর্ষতর নীতিকে প্রতিষ্ঠা করলেন। কিন্তু এটা করতে গিয়ে তিনি সাহিত্যকে লিখে দিলেন এক বিষাক্ত ইচ্ছাপত্র। তারপর থেকে এক দায়িত্বের দ্বারা অবিরল তৃষ্ণার্ত এবং আহত হয়ে তিনি আর কখনও পুরোপুরি সম্মান করতে কিংবা পুরোপুরি এড়িয়ে যেতে পারলেন না, বুদ্ধিজীবিরা সংজ্ঞায়িত হলেন তাঁর মন্দ বিবেক দিয়ে।

ভলতেয়ার একজন সুখী লেখক ছিলেন, তবে নিঃসন্দেহে তিনিই ছিলেন সর্বশেষ।

টীকা :

১. ডিইস্ট (Deist) : যে মতবাদ অনুযায়ী ঈশ্বরকে যুক্তি ও প্রকৃতির পর্যবেক্ষণের মাধ্যমেই পাওয়া যায়; কোন অলৌকিক ঘটনা বা পবিত্র গ্রন্থে লেখা বক্তব্যের মধ্যে নয়, তার নাম ডিইজম (Deism)। এই মতবাদ অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতকে ইউরোপ ও আমেরিকায় প্রবল হয়। এই মতবাদের সমর্থকদের বলা হয় ডিইস্ট।

২. ম্যানিকিয়ানিজম (Manicheanism) : খ্রিষ্টীয় তৃতীয় শতকে মেসোপটামিয়া (Mesopotamia) অঞ্চলে মনি নামে একজন ধর্মপ্রবর্তকের মতবাদের নাম ম্যানিকিয়ানিজম। এই ধর্মমত বর্তমানে পৃথিবী থেকে অবলুপ্ত।

৩. জ্যানসনিস্ট (Jansenist) : সপ্তদশ শতকের প্রথমার্ধে ডাচ থিওলজিস্ট কর্নেলিয়াস জ্যানসেনের রচনা দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে ফ্রান্সে শুরু হওয়া এক খ্রিস্টান থিওলজিক্যাল আন্দোলনের নাম জ্যানসেনিজম। এই আন্দোলনের সমর্থকদের বলা হয় জ্যানসনিস্ট।

৪. সোসিনিয়ানিজম (Socinianism) : ষোড়শ শতকে পোল্যান্ডে মাইনর রিফর্মড চার্চে ফাউস্টাস সোসিনামের নামাঙ্কিত একটি খ্রিস্টান মতবাদ।

৫. লাইবনিৎজিয়ান (Libneizian) : সপ্তদশ শতকের প্রখ্যাত জার্মান গণিতজ্ঞ ও দার্শনিক লাইবনিৎজ। তাঁর দার্শনিক মতবাদের সমর্থকদের বলা হয় লাইবনিৎজিয়ান।

৬. জেসুইট (Jesuit) : সোসাইটি অফ জিসাস এর সদস্যবর্গ। এই সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৫৪০ খ্রিস্টাব্দে। এটি ক্রমে একটি রোমান ক্যাথোলিক আন্দোলনের রূপ নেয়।

৭. মাদাম দ্য জঁলি, অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতকের প্রথমদিকের ফরাসী লেখিকা।

৮. মেমনো (Memnon) : গ্রীক উপকথায় তিনি ইথিওপিয়ার রাজা ও দেবী ইওসের সন্তান।

৯. দ্রাগোনাদ (Dragonades) : ফরাসী সম্রাট চতুর্দশ লুইয়ের প্রবর্তিত প্রটেস্টান্ট ধর্মাবলম্বীদের ওপর পীড়ন-নীতি। এর অর্থ ঊশৃঙ্খল ড্রাগন সৈন্যদের প্রটেস্টান্ট বাড়ি গিয়ে গালাগাল দেওয়া ও মালপত্র চুরিতে অনুমতি দান।

১০. রাসিন (Racine) : সপ্তদশ শতকের একজন প্রখ্যাত ফরাসী নাট্যকার।

১১. এক্সোটিজম (Exotism) : কথাটির অর্থ অপরিচিতের আকর্ষণ। ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকে উপনিবেশিকতার বিস্তারে পাশ্চাত্যের বিদ্বজ্জনের কাছে অপরিচিত চিত্রকলার আগ্রহ ইউরোপে উত্তোরত্তর বেড়ে যাওয়ার প্রেক্ষিতে এই কথাটি ব্যবহৃত।

১২. হুরন (Huron) : উত্তর আমেরিকার আদিম উপজাতি, যারা ফরাসী ও রেড ইন্ডিয়ানদের যুদ্ধে ফরাসীদের মিত্রশক্তি হিসেবে সাহায্য করেছিল।

অনুবাদ : বিদ্যুৎবরণ চৌধুরী